বালাকোট যুদ্ধ : ফিরে দেখা উপমহাদেশের কারবালার ইতিহাস

ব্রিটিশ উপনিবেশের সময় উপমহাদেশের স্বাধীনতা-সংগ্রামের ইতিহাসে বালাকোট যুদ্ধ ছিল সর্বপ্রথম বৃহৎ কোনো লড়াই। ১৮৩১ সালের ৬ মে সংঘটিত হয়েছিল বালাকোটের যুদ্ধ। বালাকোটের ময়দানের এ লড়াই একদিকে যেমন স্বাধীনতা-সংগ্রাম ছিল, অপরদিকে ছিল শরয়ি জিহাদও। দুঃখজনকভাবে সে যুদ্ধে শাহাদত বরণ করতে হয়েছিল যুদ্ধের সিপাহসালার, নায়েবে সিপাহসালারসহ অধিকাংশ সৈনিককে। এবং এরই মধ্য দিয়ে দপ করে নিভে গিয়েছিল সাইয়্যিদ আহমদ শহিদ রহমতুল্লাহ আলায়হির নেতৃত্ব গড়ে ওঠা তরিকাহ মুহাম্মদিয়া আন্দোলনের অপার সম্ভাবনা।

বালাকোট যুদ্ধের সিপাহসালার ছিলেন সাইয়্যিদ আহমদ শহিদ রহ.। তাঁর নায়েব ছিলেন তাঁরই শিষ্য সাইয়্যিদ ইসমাইল শহিদ রহমতুল্লাহ আলায়হি। সাইয়্যিদ আহমদ শহিদ ইতিপূর্বে তরিকায়ে মুহাম্মদিয়া নামে সমগ্র ভারতজুড়ে একটি আন্দোলনের সূচনা করেছিলেন। সাধারণ মুসলমানের মধ্যে শিরক ও বিদআতি কাজকর্মের সয়লাব ছিল তখন। তাদেরকে এইসব থেকে বের করে এনে ইসলামের মূল চেতনায় উদ্বুদ্ধ করতেই ছিল তাঁর এ আন্দোলন। লক্ষ লক্ষ মানুষ তাঁর হাতে বায়আত গ্রহণ করেন।

ভারত থেকে ব্রিটিশ বেনিয়াদেরকে খেদিয়ে এখানে ইসলামি হুকুমাত কীভাবে প্রতিষ্ঠা করা যায়, সে-নিয়ে ছোটবেলা থেকেই ভাবতেন সাইয়েদ আহমদ। ছোটবেলা থেকেই তিনি হয়ে উঠেছিলেন রণকৌশলে পারদর্শী একজন দক্ষ যোদ্ধা। বড় হবার পর শাহ আবদুল আজিজ মুহাদ্দিসে দেহলভির সাহচার্যপ্রাপ্ত হয়ে তাঁর সেই চেতনাকে আরও ঝালিয়ে নেন। তরিকায়ে মুহাম্মদিয়া আন্দোলন যখন সাড়া ফেলে দিলো সমগ্র ভারত জুড়ে, সাইয়িদ আহমদ শহিদ তখন তাঁর চূড়ান্ত চিন্তার কথা ভাবলেন। এ দেশকে বিদেশি বেনিয়াদের দখলদারি থেকে মুক্ত করে এখানে ইসলামি হুকুমত প্রতিষ্ঠা করতে হবে।

এই চিন্তা থেকে তাঁর একান্ত অনুসারীদের নিয়ে সাহসী তেজোদ্দীপ্ত এবং জানবাজ একটি মুজাহিদ বাহিনী তৈরি করেন। যাঁরা ইসলামের জন্য জীবন উৎসর্গ করতে সদা প্রস্তুত থাকত।

সাইয়েদ আহমাদ তৎকালীন ভারতের অভ্যন্তরে তাঁর যুদ্ধ পরিচালনার কেন্দ্র স্থাপন করেননি, এটা তাঁর রাজনৈতিক দূরদর্শিতা ও বিচক্ষণতারই পরিচায়ক। বরং তিনি তাঁর জিহাদের লক্ষ্য-উদ্দেশ্য প্রচারসহ বিভিন্ন স্থানে সফর করে এবং যুদ্ধকেন্দ্র হিসাবে আফগানিস্তানকে মনোনীত করে অবশেষে তথায় পৌঁছে যান। সঙ্গে নিয়ে যান তাঁর জানবাজ মুজাহিদ বাহিনী, সেখানেও যাবার পর স্থানীয়রাও তাঁর দ্বারা প্রভাবিত হয়ে মুজাহিদ বাহিনীতে নাম লেখায়। আফগানিস্তানের কান্দাহার, কাবুল অতিক্রম করে জানবাজ এ মুজাহিদ কাফেলা নিয়ে সাইয়িদ আহমদ খেশগিতে উপস্থিত হন এবং সেখান থেকে ১৮ই সেপ্টেম্বর ১৮২৬ নওশহরে অবস্থান গ্রহণ করেন। সেখানে তিনি অত্যাচারী শিখ রাজা বুখ্য সিং-এর বিরুদ্ধে যুদ্ধের সিদ্ধান্ত নেন এবং প্রথমে কর বা জিজিয়া প্রদানের প্রস্তাব দেন। এরপরই একজন সংবাদবাহক এসে খবর দেয় যে, বুখ্য সিং সৈন্য নিয়ে আকুড়ায় প্রবেশ করেছে। একথা শুনে সকলকে প্রস্তুতি গ্রহণের নির্দেশ প্রদান করেন। মুসলিম বাহিনীর নৈশকালীন

অতর্কিত হামলায় সাতশত শিখ সেনা নিহত হয় এবং মুসলমানদের পক্ষে ৩৬ জন ভারতীয় ও ৪৫ জন কান্দাহারী মুজাহিদ নিহত হন এবং আরও ৩০/৪০ জন আহত হন। এই যুদ্ধজয়ের মধ্য দিয়েই মুসলমানদের সাহস, আগ্রহ-উদ্দীপনা শতগুণে বেড়ে যায়। কান্দাহার পেশোয়ারের বড় একটি অংশ জুড়ে আহমদ শহিদের নেতৃত্বে প্রতিষ্ঠিত হয় ইসলামি হুকুমত।

তৎকালীন পেশোয়ারের সুলতান মুহাম্মাদ খাতেনের ষড়যন্ত্রে ইসলামি হুকুমতের কাজি, তহসিলদারসহ বহু কর্মচারীর গণহত্যার ঘটনায় সাইয়েদ আহমাদ অত্যন্ত মর্মাহত হন এবং তিনি দ্বিতীয় দফা হিজরত করার মানসে কাশ্মীর অভিমুখে যাত্রা করার চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন।

সাইয়েদ আহমাদ শহীদ পাঞ্জতার নামক স্থানে অবস্থানরত মুজাহিদ গোত্র ত্যাগ করেন এবং হাযারা জেলার উচ্চভূমির দিকে গমন করেন। তাঁর উদ্দেশ্য ছিল কাশ্মীরের দিকে অগ্রসর হয়ে সেখানে কেন্দ্র স্থাপন করে উপমহাদেশকে অমুসলিম ও বিদেশীদের দখল হতে মুক্ত করার পরিকল্পনা বাস্তবায়ন করা। কাশ্মীরের দিকে অগ্রসর হবার প্রস্তুতি গ্রহণে সবচেয়ে উপযুক্ত স্থান ছিল এই বালাকোট, সেকারণ এখানেই সামরিক ঘাঁটি স্থাপন করা হয়। অবশ্য প্রথম দিকে প্রধান সামরিক ঘাঁটি রাওয়ালপিণ্ডিতে স্থানান্তরিত করা হয়েছিল। সাইয়েদ আহমাদ শহীদ রহ. তাঁর দীর্ঘ চার বছরের পাঞ্জতার ঘাঁটি ছেড়ে কাশ্মীরের উদ্দেশ্যে যাত্রার সময়টি ছিল ডিসেম্বরের বরফঢাকা শীতকাল।

সাইয়্যিদ আহমাদ কাশ্মীরের উদ্দেশ্যে রওয়ানা দিয়ে যে এলাকাটি ত্যাগ করেছিলেন শিখরা শীঘ্রই সে এলাকাটি দখল করে তথাকার জনগণের ওপর নির্যাতন চালায়। এ সময় কাশ্মীর গমনের পথে বিভিন্ন এলাকার খান ও সামন্তগণ যেমন—মুজাফ্ফরাবাদের শাসনকর্তা যবরদস্ত খান, খুড়া অঞ্চলের সামন্ত নাজা খান, দেরাবা অঞ্চলের সামন্ত মানসুর খান ও গাঢ়ী অঞ্চলের সামন্ত হাবিবুল্লাহ খান প্রমুখ সাইয়েদ আহমাদ শহিদের সাহায্য সাহায্য প্রার্থনা করেন। সাইয়েদ আহমাদ এই আবেদনে সাড়া দিয়ে যবরদস্ত খানের সাহায্যার্থে মৌলভি খায়রুদ্দিন শেরকুটীর নেতৃত্বে একদল মুহাজিদ মুযাফ্ফরবাদে প্রেরণ করেন। এদিকে শিখ সেনাপতি রনজিৎ সিংহ-এর পুত্র শেরসিংহ বিরাট বাহিনী নিয়ে নখলী নামক স্থানে পৌঁছে যায়। ফলে সাইয়েদ আহমাদ উক্ত বাহিনী কোন দিকে অগ্রসর হয় তার গতিপথ নির্ণয় করে পরবর্তী করণীয় স্থির করাকে সমীচীন মনে করেন।

এ সময় তিনি মূল গন্তব্য কাশ্মীরের দিকে অগ্রসর হওয়ার নিমিত্তে শের সিং-এর বাহিনীর বিরুদ্ধে সংঘর্ষে লিপ্ত না হয়ে এগিয়ে যেতে পারতেন, কিন্তু তা তিনি করেননি। কারণ হাযারাবেলাতে অবস্থানকারী সাইয়েদ আহমাদ-এর সাথে ঘনিষ্ঠ সম্পর্কে সম্পৃক্ত খানদের শিখ সেনারা অত্যাচারের শিকার বানাত। তাই তিনি তাদের নিরাপত্তার ব্যবস্থা নিশ্চিত না করা পর্যন্ত হাযারাতেই থেকে গেলেন। পরে যখন তিনি শুনতে পেলেন যে, শের সিংহ ভূগাড়মুঙ্গ গিরিপথ আক্রমণ করার পরিকল্পনা করছে, তখন তিনি নিজে রাজদারওয়ান নামক স্থান হতে সারচুল নামক স্থানে পৌঁছান এবং শাহ ইসমাঈল শহীদকে বালাকোট পাঠিয়ে দিলেন। তারপর যখন তিনি জানলেন যে, শের সিং বালাকোট আক্রমণ করতে পারে তখন তিনি ভুগাড়মুঙ্গের নিরাপত্তার ব্যবস্থা করে নিজেই বালাকোটে চলে গেলেন। আর সেই সময় শের সিং-এর বাহিনী কুনহার নদীর পূর্ব তীরে অবস্থিত সোহাল নাজাফ খান গ্রামের সম্মুখে ময়দান নামক স্থানে শিবির স্থাপন করে।

বালাকোটে সাইয়েদ আহমদ ও ইসমাইল শহিদের নেতৃত্বে মাত্র সাত শত মুজাহিদ আর অপরদিকে শের সিংহের

নেতৃত্বে শিখ বাহিনীর সৈন্য সংখ্যা ১০ হাজার। বালাকোটের যেখানটায় মুজাহিদ বাহিনী অবস্থান নিয়েছিলেন, পাহাড়ি গিরি পথ মাড়িয়ে শিখ বাহিনী এত সহজে এ জায়গায় পৌঁছতে পারত না। কিন্তু স্থানীয় মুসলমানদের গাদ্দারির কারণে বালাকোট পর্যন্ত পৌঁছার রাস্তা পেয়ে যায় শিখবাহিনী। অবশেষে আসে ১৮৩১ সালের ৬ মে। ১০ হাজারের মুকাবেলায় মাত্র সাত শত মুজাহিদ, জীবনবাজি রেখে তাঁরা লড়াই চালিয়ে যান। শাহাদত বরণ করেন সাইয়্যিদ আহমদ শহিদ ও ইসমাইল শহিদ রহ.। তাঁদের সঙ্গে বীর বিক্রমে লড়তে লড়তে ছোট্ট এ বাহিনীর বেশির ভাগ সৈন্যই পান করেন শাহাদতের অমীয় সুধা।

মুজাহিদদের সংখ্যাস্বল্পতা ও রসদপত্রের অপ্রতুলতা বালাকোটের যুদ্ধে পরাজয়ের অন্যতম কারণ হিসাবে ঐতিহাসিকরা উল্লেখ করলেও পরাজয়ের মূল কারণ ছিল স্থানীয় মুসলিমদের বিশ্বাসঘাতকতা। যেসব সামন্ত ও খানরা শিখবাহিনীর হাত থেকে তাদেরকে রক্ষার জন্য সাইয়েদ আহমাদকে আহ্বান করেছিল তারা পরবর্তীতে মুসলমানদের সাহায্য না করে গোপনে শিখদের সাথে হাত মেলায়।

দ্বিতীয়ত শিখবাহিনী যখন মেটিকোটে আরোহণের চেষ্টা করছিল তখন সেখানে পাহারায় থাকা মুজাহিদ বাহিনীতে অনুপ্রবেশকারী কিছু স্থানীয় মুসলিম তাদেরকে গোপন পথ বাতলে দেয়। এই সাহায্য না পেলে শিখবাহিনী মেটিকোটে প্রবেশ করতে পারত না।

তৃতীয়ত সাইয়েদ আহমাদের সাথে চূড়ান্ত বিশ্বাসঘাতকতা করে হাযারার এক উপজাতীয় প্রধান শিখদেরকে বালাকোটের সাথে সংযুক্ত পাহাড়ের উপরিভাগে ওঠার গোপন পথের সন্ধান দেয়।

এ ছাড়া পরোক্ষ আরো কিছু কারণ ছিল এ যুদ্ধে পরাজয়ের। উপমহাদেশের মূল ভূখণ্ড বাংলা, বিহার, মধ্যপ্রদেশ প্রভৃতি অঞ্চল থেকে এক থেকে দুই হাজার অনুসারী সৈয়দ সাহেবের সাথে পশ্চিম সীমান্তে যায়। তারা ইসলামি চেতনাসম্পন্ন ছিল। কিন্তু স্থানীয় পাঠানরা তিন লাখ লোক দিয়ে সহায়তা করলেও এরা সরদার বা গোত্রীয় শাসকের দ্বারা প্রভাবিত ছিল। এই সরদার ও শাসকদের অনেককেই শিখ ও ইংরেজ কর্তৃপক্ষের দলে নাম লেখায়। ফলে দরিদ্র ও কুসংস্কারাচ্ছন্ন পাঠান সিপাহিরাও বিভ্রান্ত হয়ে পড়ে শত্রুর মনস্তাত্ত্বিক লড়াইয়ে।

আধুনিক রণকৌশলের প্রশিক্ষণ তেমন ছিল না মুজাহিদ বাহিনীর। সাইয়্যিদ আহমদ শহিদ পাঠান নেতা সুলতান মুহাম্মদ খাঁ ও তার ভাইদের বিশ্বাস করে সুলতানকে পেশোয়ারের প্রশাসক বানান। সে বিশ্বাসঘাতকতা করে কয়েক শ’ উঁচুস্তরের মুজাহিদকে এক রাতে খুন করেছিল। ফলে পেশোয়ার হাতছাড়া হয়ে যায় সৈয়দ সাহেবের।

পাঠানেরা জিহাদ করার চেয়ে লুটপাটে বেশি আগ্রহী ছিল।

সাইয়্যিদ আহমদ শহিদকে আসলেই মোকাবেলা করতে হয়েছে (যদিও পরোক্ষভাবে) ইউরোপীয়দের, যাদের সূর্য সেই সময় মধ্যগগনে। প্রায় সমগ্র বিশ্বকে তারা কবজা করে ফেলেছিল। সেখানে ছিল স্বার্থপর, কুসংস্কারাচ্ছন্ন ও বিশ্বাসঘাতক সরদার ও তাদের অনুসারীরা। ফলে এভাবেই ঈমানী শক্তিতে বলীয়ান মুজাহিদ বাহিনীর চূড়ান্ত বিপর্যয় ঘটে।